সম্মাননাপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের অনুভূতি

সম্মাননাপ্রাপ্ত গুণী শিক্ষকগণের অনুভূতি প্রকাশ

প্রফেসর ড. দাস বাসুদেব কুমার

আজ বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে যে সম্মাননা আমাকে প্রদান করা হয়েছে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি বিশ্ববিদ্যালয়কে এজন্য ধন্যবাদ জানাই। আজ থেকে প্রায় ১৪ বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেছি। একজন শিক্ষক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা, ডিপার্টমেন্টে যাওয়া, ক্লাস নেওয়া এসব ছাড়া থাকতে পারি না। যতই সমস্যা থাকুক ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছি। আমি ডিপার্টমেন্টে গিয়েছি, বহু শিক্ষকের সাথে কথা হয়েছে। তারা যেভাবে আমাকে গ্রহণ করেছে, সম্মান দেখিয়েছে, আমি বার বার ডিপার্টমেন্টে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রলুব্ধ হয়েছি।

আমি জানি বারবার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া, ডিপার্টমেন্টে যাওয়া, তাদের সাথে সঙ্গ দেওয়া, তারা যে অ্যাকাডেমিক কাজ করে অনুভব করি, আমি বারবার ফিরে গিয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়, ডিপার্টমেন্টে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। আমার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে, আমি শেয়ার করবো এবং আমি মনে করি বিশ্ববিদ্যালয়ের আগের বা বর্তমান যারা শিক্ষক আছে একটু ভেবে দেখবেন এবং সমাধানের চেষ্টা করবেন। তারা সত্যিকারেই শিক্ষকের যে সংজ্ঞা সে সংজ্ঞায় তারা সত্যিকারের শিক্ষক। এমন শিক্ষক যারা শ্রেণিকক্ষ থেকে ফিরে এসে ভীষণ হতাশ। এই যে হতাশাটা শুধু একজনের নয়। অনেকের মধ্যে এই হতাশা চলে এসেছে। কেন এই হতাশা? কেন এমন হচ্ছে? আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্র-ছাত্রী এসেছে, তারা ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে সেই সব ছাত্র-ছাত্রী এখন কিছু কিছু শিক্ষকদের শিক্ষক হিসেবে মানছেন না। সমস্যাটা কোথায়? আমার মনে হয় তারা এতো প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করেই এইসব ছাত্র-ছাত্রীরাই তো একদিন নেতৃত্ব দেবে, তারাই তো স্বপ্ন পূরণ করবে। কি সমস্যায় ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকদের সহ্য করতে পারছে না তা বুঝে ছাত্র-ছাত্রীদের চালিত করতে হবে। যারা শিক্ষক হিসেবেই পরিচিত তারা সম্মানিত হোক। ছাত্র-ছাত্রীরা আমাদের সন্তান, রাষ্ট্রের জন্য তাদের তৈরি করতে হবে। সকলকে ধন্যবাদ।

প্রফেসর ড. এ কে এম আজহারুল ইসলাম

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।

আজ বিশ্ব শিক্ষক দিবস। এ উপলক্ষে আয়োজিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের অনুষ্ঠানের সভাপতি ভাইস চ্যান্সেলর, প্রধান অতিথি, সম্মাননাপ্রাপ্ত ও সামনে উপবিষ্ট শিক্ষকবৃন্দ এবং প্রাণপ্রিয় ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ - সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

৫ অক্টোবর হচ্ছে ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত বিশ্ব শিক্ষক দিবস। প্রতি বছরে এই দিবসের একটি প্রতিপাদ্য বিষয় থাকে। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় 'শিক্ষকের কণ্ঠস্বর: শিক্ষায় নতুন সামাজিক অঙ্গীকার'। এই প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্ব শিক্ষক দিবস, ২০২৪' উপলক্ষে কর্মসূচি নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষকদের জন্য নিঃসন্দেহে দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষকের সম্মানার্থে পৃথিবীর বহু দেশে এই দিনটি উদ্‌যাপিত হয়। বিভিন্ন দেশে শিক্ষকদের তাদের নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য সম্মাননা প্রদান করা হয়। এই দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের সম্মানীত সকল শিক্ষককে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমরা জানি শিক্ষা হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড। আর শিক্ষা যদি জাতির মেরুদণ্ড হয় তবে শিক্ষকরা হলেন শিক্ষার মেরুদণ্ড। শিক্ষার মেরুদণ্ড, জাতির মেরুদণ্ড বলতে কি বোঝা যায়? এটি কি মানুষের মেরুদণ্ডস্বরূপ। এর দুর্বলতার কারণে আমাদের শরীরে অসুস্থতা বুঝায়, এসময় আমরা কোনো কিছু করতে সক্ষম হই না। মেরুদণ্ড, সেটা শারীরিক দিক দিয়ে হোক, জ্ঞানের দিক দিয়ে হোক, জাতির মেরুদণ্ডের কথা বলছি। আর শিক্ষকরা হলো শিক্ষার মেরুদণ্ড। আর যে শিক্ষার কথা আমরা বলে থাকি সে শিক্ষা যদি দুর্বল হয়, সেই শিক্ষার আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের অবদান এখানে অপরিসীম। আর এই দুর্বল মেরুদণ্ড কেন হয়, সেটা আমরা জানি।

আমরা জানি কিভাবে গত এক দেড় দশক ধরে বা তারও বেশি সময় ধরে এই শিক্ষাব্যবস্থার মেরুদণ্ডকে প্রায় অকেজো করা হয়েছে। এখানে সেই শিক্ষা হলো প্রাইমারি লেভেল থেকে উচ্চতর লেভেল পর্যন্ত। আজকে এখানে উপস্থিত আছে উচ্চতর লেভেল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। এই লেভেলে যে মেরুদণ্ডের কথা আমরা বলি সেটা নষ্ট করে একটা নাজুক অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই অবস্থা সৃষ্টির জন্য গত ১৫-১৬ বছরে ধরে শিক্ষার অপূরণীয় ক্ষতি করা হয়েছে। আজকে শিক্ষকদের উপরও চলছে নানা ধরনের অত্যাচার, অবিচার। আর ছাত্রদের উপরতো শুরু হয়েছে আগে থেকেই। কাজেই এই অনাকাঙ্খিত নাজুক পরিস্থিতির কারণে লেখাপড়া হচ্ছে নামে মাত্র।

আমরা প্রায়ই বলি আমরা নাকি শিক্ষাক্ষেত্রে বিদেশের সমতুল্য হয়ে গেছি। নো, হইনি। যা ছিল আস্তে আস্তে তার থেকে আমরা খারাপ করছি। আমি যখন প্রাইমারিতে পড়ি, ১৯৫১-১৯৫২ সালের দিকে তখন আমার মনে আছে কলার পাতায় লিখেছি। কলার পাতায় লেখা শিখে ও স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করেও তখন অনেকে যথাযথভাবে উচ্চশিক্ষিত হয়েছে। সময়মত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৬৭ সনে সময়মতো আমার এমএসসি থিসিস পরীক্ষাও হয়ে গেছে। এখন সময়মত পরীক্ষা হয় না কেন? ক্রমশ দিন-কে-দিন তা বরং আরো পিছিয়ে যাচ্ছে। এটার মুখ্য কারণ হলো সরকারি অব্যবস্থাপনা ও ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তপরায়ণতা। এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে হবে!

স্কুলে, কলেজে কি সঠিকভাবে লেখাপড়া হয়? হয় না। স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেই কি অভিভাবকের চিন্তা দূর হলো? ছেলেমেয়েরা হয়তো স্কুল পার হবে– কিন্তু সেকি কিছু শিখলো? ওখানেতো আজকাল ঠিকমত পড়াশোনাই হয় না। কোচিং-বাণিজ্যতো রমরমা! শিক্ষকরা কেন এতে জড়িত? এতে তাদের এত বেশি আগ্রহ কেন? শিক্ষার যে এই অবস্থা, সেই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে।

আর সরকারকেই তো এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে। শিক্ষাকে যথাযথভাবে চলতে দিতে হবে। যেভাবে প্রয়োজন সেই ভাবে তা অগ্রসর হবে। তাতে শিক্ষকরা ভালো থাকবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভালো থাকবে। তাহলে আমরা বর্তমান যে পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছি তা থেকে উত্তরণ পাবো।

আজ দেশ দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। আর এই যে দুর্নীতি! এখন কি হচ্ছে, শিক্ষা সংক্রান্ত সরকারি অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজের অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর নিয়ে খবর বের হচ্ছে শিক্ষকের অনিয়ম-দুর্নীতি। সবত্রই একটা হযবরল অবস্থা।

চিন্তাই করিনি এই যে আইজি বেনজির সাহেব, তার দুর্নীতির খবর প্রথম প্রকাশের পর থেকেই অসংখ্য অবিশ্বাস্য দুর্নীতির খবর আমরা অহরহ জানতে পারছি। প্রাইম মিনিস্টারের কেরানিও চারশ কোটি টাকার মালিক। আর প্রাইম মিনিস্টার প্রায় হাসিমাখা মুখে তা প্রকাশ করতে এতটুকু পরিমাণ দ্বিধাবোধ করেননি বা তার লজ্জাবোধও পরিলক্ষিত হয়নি। এরকম কোন আক্ষেপ-ভ্রক্ষেপবিহীন অবস্থা কাদের মধ্যে দেখা যায়? তাহলে দেশের শিক্ষাসহ সবকিছু কেমন নেতৃত্বের অধীনে চলেছে!

এই অবস্থা চলতে দেওয়া যাবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে আমাদের গভর্নিং বডি, তারাই সব করতে চায়, লেখাপড়া করাতে চায় না। শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের যে প্রয়োজন সেই ভাবে অগ্রসর হতে হবে তাহলে আমরা বর্তমান যে পরিস্থিতি তার থেকে উত্তরণ পাবো।

শিক্ষক জাতির মেরুদণ্ডের কারিগর – কুশিক্ষা নয়, সুশিক্ষাই হবে জাতির মেরুদণ্ড। দুর্বল মেরুদণ্ডকে বলিষ্ঠ করা এখন সময়ের দাবি। বর্তমানে শিক্ষার মানের নাজুক অবস্থা - অথচ তা নিয়ে দেশের হর্তাকর্তাদের উদ্বেগ নাই। কেবল শিক্ষার হার বৃদ্ধি নিয়ে বড়াই করে। নৈতিক শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড- বর্তমানে শিক্ষিত মানুষের অনৈতিক কার্যকলাপের যে ছড়াছড়ি দেখতে পাচ্ছি তাতে আর এ জাতির মেরুদণ্ড থাকবেনা, অচিরেই বিকৃত রুচির মানুষে ভরপুর হয়ে যাবে। মাছের যেমন পচন শুরু হয় মাথা থেকে ঠিক তেমনি জাতির অধঃপতন শুরু হয় জাতির নেতৃবৃন্দ তথা রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মাধ্যমে। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমন ভাবে প্রবেশ করেছে যে, উল্কার গতিতে তা পুরো জাতিকে ধ্বংসের দিকে তাড়িত করছে। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কারণে মানহীন শিক্ষকের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন অনিয়ম দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে, অভিযোগ ও অনিয়মের হিড়িক পড়েছে। এগুলোতে রয়েছে স্কুল গভর্নিং বডির সদস্য, পাশাপাশি স্কুল শিক্ষকদের নামে অভিযোগের মশাল বইছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিছু ব্যক্তির চাপের তোপে পড়ে সাদা মনের, মহান পেশার শিক্ষক তাঁদের কর্মকে টিকিয়ে রাখতে বিভিন্ন অনিয়মের পথে যুক্ত হয়ে পড়েন। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো অনেক শিক্ষকের নেই পর্যাপ্ত যোগ্যতা, উচ্চশিক্ষা, ব্যক্তিত্ব, গাম্ভীর্য ও স্বীকৃতি। এই রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের শিকার হয়েই কোমলমতি শিক্ষার্থীরা বই বিমুখ হচ্ছে।

বিশ্ব শিক্ষক দিবসে প্রত্যাশা: অন্য দশ জনের মত না হয়ে সমাজের প্রত্যাশা মোতাবেক একজন শিক্ষক কেমন হবেন? তিনি হবেন জ্ঞানতাপস, মেধাবী, বুদ্ধিদীপ্ত, ব্যক্তিত্ববান, চৌকস, শ্রেণিকক্ষে আগ্রহী পাঠদানকারী ও জ্ঞান বিতরণে আন্তরিক। শিক্ষক হবেন সুবিচারক, শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রক, যুক্তিবাদী গবেষক এবং উদ্ভাবকও। তিনি সঠিক পথের দিশারী, পথপ্রদর্শক । Publish or Perish নীতিতে তিনি হবেন শিক্ষক-গবেষক।

শিক্ষক হবেন সহজ, সরল, নির্মল এবং অকুতোভয়, সত্যবাদী। তিনি হবেন চারিত্রিক দৃঢ়তাসম্পন্ন, পরিশ্রমী, নিরপেক্ষ, সুপরামর্শক ও প্রাণবন্ত গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। শিক্ষকদের অতীত ঐতিহ্য ফিরে পেতে শিক্ষকদের মান-মর্যাদা ও দক্ষতা বাড়াতে নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে, গতানুগতিক চিন্তাভাবনা দিয়ে হবে না।

এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলে আমি শেষ করবো। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো ও যারা পড়াই অনেক শিক্ষকেরই নেই পর্যাপ্ত যোগ্যতা। উচ্চশিক্ষাও নেই। ব্যক্তিত্বও নাই। ব্যক্তিত্ব কেন নেই এটা আমরা বুঝতে পেরেছি। তাদের গাম্ভীর্য নেই। শিক্ষকের গাম্ভীর্য থাকবে, তাই বলে শিক্ষার্থীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে সেটাকে গাম্ভীর্য বলে না। তাদের সাথে বাপ-মার মতো ব্যবহার করতে হবে।

এই অযোগ্যতা আর দুর্বৃত্তপরায়ণতা থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে বাঁচাতে হবে এবং শিক্ষকদেরকে মূখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। সাম্প্রতিক অতীতে শিক্ষাক্ষেত্রে যাদের দায়িত্ব ছিল তারা একজন ডাক্তার আর একজন ব্যারিস্টার। তাদের সবাইকে আমরা ভালো করেই চিনি তারা কি রকম লোক। তাদের নেতৃত্বে শিক্ষার এমন হাল!

আপনারা সবাই সচেতন থাকবেন। আমাদের প্রত্যাশা থাকবে অন্য দশজনের মতো না হয়ে আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষকবৃন্দ কাজ করবেন? একজন শিক্ষক কি ধরনের হবেন? একজন শিক্ষক হবেন জ্ঞানতাপস। শিক্ষক হবেন বুদ্ধিদীপ্ত ও ব্যক্তিত্ববান। শিক্ষক হবেন চৌকস এবং জ্ঞান বিতরণে আন্তরিক। আর এই ধরনের শিক্ষক জাতির প্রয়োজন। শিক্ষককে হতে হবে সুবিচারক। শিক্ষককে হতে হবে নির্মল, অকুতোভয়, সত্যবাদী। তিনি হবেন চারিত্রিক দিক দিয়ে উচ্চমানের, পরিশ্রমী। তিনি খাতা না দেখে অন্য কাজ করছেন এমন হবেন না। তিনি হবেন সব প্রশ্নের উর্ধ্বে। কিছু কিছু ঘটনা শোনা যায় যে শিক্ষক ছাত্রদের সাথে যথেষ্ট দুর্ব্যবহার করেন।

আজকে শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আমার এবং সমাজের প্রত্যাশার কথা বলেছি। শিক্ষকদের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে হবে। শিক্ষকদের মান, মর্যাদা, দক্ষতা বাড়াতে নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে। চিন্তা ভাবনা ছাড়া সলিউশন করা সম্ভব নয়। কাজেই আমাদের আন্তরিকতা সবাই শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা, কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়। স্বাধীনতার সুফল ভোগ ও দেশের স্বাথের জন্য সবাইকে সদা সতর্ক হতে হবে।

প্রফেসর ড. মু. শামসুল আলম, বীর প্রতীক

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রহিম।

সম্মানিত উপাচার্য, প্রধান অতিথি, বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে সম্মাননাপ্রাপ্ত আমার সহকর্মীবৃন্দ, প্রশাসক জনসংযোগ দপ্তর, আমার সম্মুখে উপস্থিত শিক্ষক ও প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এই প্রথমবার বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন হচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে আমি সকল স্তরের শিক্ষকবৃন্দকে এ দিবসের সালাম ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ১৯৯৪ সালে। ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড এডুকেশন দিবস ও আন্তর্জাতিক শিক্ষক দিবস পালিত হয়ে আসছে। শিক্ষক দিবস সকল শিক্ষাঙ্গনে ছড়িয়ে দিতে হবে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য হলো, দেশে প্রাথমিক শিক্ষকরা ১১তম থেকে ১০তম গ্রেডে যাওয়ার জন্য শিক্ষক দিবস হতে আন্দোলন শুরু করেছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, উপসচিব থেকে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা গাড়ী ভাতা পায়। আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ১১তম থেকে ১০ম গ্রেডে যাওয়ার আন্দোলন করছে উপসচিবের গাড়ী ভাতার অর্ধেকেরও কম। কী করে বাংলাদেশে কোমলমতি শিশুদের শিক্ষার বুনিয়াদ দৃঢ় হবে? ফেসবুকে অনেকে লিখেছিল যে, বাংলাদেশের অতীত বলে কিছু নেই? কিন্তু Future is the continuation of past and present.

আমি আমেরিকা ওহাইও স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুলব্রাইট স্কলার হিসেবে গবেষণার সময় একটি সম্মেলনে যাই। সে সময়ে ওহাইও স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল সমিতির সভাপতি ও অধ্যাপক রেস হানি আমার সঙ্গে আলাপ করেন। আলাপের বিষয় ছিল ওহাইও স্টেটে মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলাদেশের ভূগোল অন্তর্ভুক্ত করা। এক বছরের প্রস্তুতিতে তাঁরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগসহ রাজশাহী কলেজ ও মহিলা কলেজে বক্তৃতা করেন। তাঁরা বাংলাদেশের বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শন ও বক্তৃতা করেন; পরিশেষে আমেরিকান দূতাবাসে আসেন। তৎকালীন রাষ্ট্রদূত ও শিক্ষা কর্মকর্তা বলেছিলেন `This is what we want from a Fulbright Scholoar'। এখন ওহাইও স্টেটে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বাংলাদেশের ভূগোল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ইউনেস্কোর মতে, বিশ্ব শিক্ষক দিবস শিক্ষা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখবে। আসুন, আমরা প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষকদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করি।

আল্লাহ হাফিজ।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৪ এ সম্মাননাপ্রাপ্ত শিক্ষকের বক্তব্য, ঈষৎ পরিমার্জিত

রচনাসমূহ

রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান: স্নাতক পর্যায়

স্নাতক পর্যায় : প্রথম স্থান

আমার দেখা সেরা শিক্ষক

মো. শামিম আলম

সমাজকর্ম বিভাগ শহীদ জিয়াউর রহমান হল

আমার দেখা সেরা শিক্ষক ছিলেন সক্রেটিস! না, আমি গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসের কথা বলছি না। মুহাম্মদ মফিদুল ইসলাম বি.এস.সি ওরফে সক্রেটিস। বড়দের কাছে শুনেছি, উনি তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে হাটবাজার, চায়ের দোকান যেখানেই পেতেন সেখানেই শিক্ষাদান করতেন এবং সক্রেটিসের একজন ভক্তও ছিলেন; তাই আমাদের ইউ.এন.ও. স্যার একটা প্রোগ্রামে তাঁকে বাংলার সক্রেটিস বলে আখ্যায়িত করেন। আর এই নামে তিনি এতো বেশি পরিচিত হন যে, স্কুলের নতুন শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই তাঁর আসল নাম জানতো না।

ষষ্ঠ শ্রেণির প্রথম ক্লাসে তিনি আমার পরিচয় জানতে চাইলে, আমি হাউমাউ করে কান্না শুরু করি। তৎক্ষণাৎ তিনি আমার কাছে এসে বাবার মতো আদর করে কোলে তুলে নেয় আর বলতে থাকে "আমার পাগল ছেলে; তুমি রাজিবের মতই হয়েছো।" (রাজিব স্যারের ছোট ছেলে, সে তখন আমাদের সাথেই পড়তো।) এ ঘটনার পর থেকে স্যার প্রায়ই আমাকে ডেকে কথা বলতেন, সাহস দিতেন। কিন্তু আমি ছিলাম ইন্ট্রোভার্ট; অন্যের সাথে মিশতেই পারতাম না। কিন্তু স্যারের সঙ্গে আমার একটা খুবই ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠল।

তারপর থেকে আমি প্রায়ই রাজিবের সাথে ওদের বাসায় যেতাম; আর স্যার আমাকে দেখামাত্রই কাছে ডেকে নিতেন, তাঁর পারিবারিক লাইব্রেরি থেকে একটা বই পছন্দ করে নিতে বলতেন। তারপর সেটা শেষ করে আমি আবারও স্যারের কাছ থেকে আরেকটা বই নিয়ে আসতাম; এভাবেই আমি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎ, বঙ্কিম থেকে শুরু করে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বই পড়লাম, আর স্যারের সাথে বই নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। স্যার আমার কবিতার খুব পছন্দ করতেন, তাই স্যারকে প্রায়ই স্বরচিত কবিতা শুনিয়ে আসতাম। স্যার বলতেন, "তোমার লেখা, লেখা হচ্ছে শামীম! লেখা থামিয়ে দিও না।" এসব শুনে আমি আরও বেশি করে লেখালেখি শুরু করি; এভাবে কেটে যায় তিনটা বছর।

তখন আমি নবম শ্রেণির ছাত্র। ষান্মাসিক পরীক্ষাতে রসায়নে ফেইল করলাম। রেজাল্ট শুনেই আমি স্যারের কাছে গিয়ে চুপ করে থাকি। পরে আমাকে নিয়ে তাঁর বাসায় আসেন। তারপর তাঁর পারিবারিক লাইব্রেরিতে নিয়ে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ছবি দেখান ও জীবনের গল্প বলতে থাকেন। বিশেষ করে টমাস আলভা এডিসনের গল্পটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে এবং আমি নিজের মধ্যে সম্ভাবনা দেখতে পাই। সেদিন বাবার ভয়ে আর বাসায় যাইনি, স্যার বাবাকে কল করে বলে দিয়েছিলেন। জানিনা স্যার বাবাকে কী বলেছিলেন! পরের দিন বাসায় গেলেও বাবা আমাকে তেমন কিছু বললেন না। শুধু বললেন, "মফিদুল ভাইয়ের সাথে কথা হইছে, উনি কী বলে একটু মান্য করে চলো বাবা।"

তারপর আমি পড়াশোনায় বেশ মনোযোগী হয়ে উঠি। স্যারের কাছে গিয়ে ম্যাথ শিখি এবং পাশাপাশি তো আলোচনা আছেই। কীভাবে যেন স্যার আমার মধ্যে একটা সম্ভাবনা দেখতে পেতেন! আমাকে স্যার মাঝেমধ্যেই বলতেই, ও শামীম, আমাদের স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কেউ এখনো পড়তে পারেনি! আমার মনে হয় তুমি সেটা পারবে।" আমি তখন ভাবতাম স্যার আমাকে নিয়ে বেশি বেশি বলে, তিনি আমাকে ভালোবাসেন তাই হয়তো।

তারপর আমি এস.এস.সি. তে সাধারণ একটা ফলাফল করি। স্যার ভেবেছিলেন আমি এ+ পাব আর রাজিব টেনেটুনে এ পাবে। কিন্তু দেখা গেল আমরা দুইজনই ৪.৩৩ পেয়ে উত্তীর্ণ হলাম। ছেলের ফলাফলে স্যার খুশি ছিলেন কিন্তু আমার ফলাফলে তিনি হতাশ হয়েছিলেন। রাজিবের কাছে শুনেছি, স্যার সেই দিন লাইব্রেরিতে বসে বই না পড়ে শুধু চিন্তা করেছিলেন।

কলেজে ভর্তি হলেও আমি সময় বের করে স্যারের বাসায় যাতায়াত করতাম। মনে হচ্ছিল আমি তাঁদের পারিবারের একজন সদস্য। তখনও স্যার আমাকে ডেকে কাছে বসাতেন এবং আগের মতই গল্পের ছলে আমাকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতেন। 'বিশ্ববিদ্যালয় কী? কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হবে? বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লে নিজের অবস্থান সৃষ্টি করে দেশ গঠনে বৃহত্তম পরিসরে দেশের সেবা করা যায় কিনা?' এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। তখন আমি মনে মনে কল্পনা করতাম, 'ইশ! যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারতাম!' যাই হোক কলেজ জীবনে এসে আমি স্যারের আরও বেশি ভক্ত হয়ে যাই। স্যার আমাকে ধীরে ধীরে আবার নার্সিং শুরু করেন। তিনি তখন আমাকে বাংলা পড়ানো শুরু করলেন। একটা কথা বলা প্রয়োজন, স্যার ম্যাথের শিক্ষক হলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে তিনি মাঝে মধ্যে সৈয়দ হকের (সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক) সঙ্গেও আলোচনা করতেন। সৈয়দ হকও নিজ জন্মভূমিতে (কুড়িগ্রাম) আসলে স্যারকে আড্ডার দাওয়াত দিতেন। অতএব বুঝতেই পেরেছেন স্যার বাংলাটাও বেশ ভালো পড়ান।

প্রচুর পড়াশোনা ও আলোচনায় সময় দিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকের শেষ প্রান্তে চলে আসলাম। পরীক্ষার আগে করোনা মহামারীর কারণে তা পিছিয়ে দেওয়া হলো। তারপরের ঘটনা সবাই জানি! কি আর! অটোপাস! নিজের জীবনের সেরা প্রস্তুতির ফলাফলটা আমি জানতে পারলাম না। ৪.৭৫ জি.পি.এ. এর সঙ্গে হতাশা নামক উপলব্ধি নিয়ে এইস.এস.সি. পাস করলাম। স্যার তখন প্রায়ই বলতেন, 'পরিশ্রম কখনো বৃথা যায়না, শামীম। এই পরিশ্রমের ফলেই তুমি অনেক ভালো কিছু করবে ইনশাআল্লাহ।'

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতিটাও স্যারের হাত ধরেই শুরু করলাম, কেননা করোনা মহামারীর কারণে সব অফলাইন কোচিং বন্ধ। আর আমার কোনো মোবাইল ফোন না থাকায় অনলাইনেও কোচিং করা সম্ভব নয়। স্যার আমাকে আর রাজিবকে পড়াতে গিয়ে আগের রাতে তিনি প্রচুর পড়াশোনা করতেন আর পরের দিন আমাদের পড়াতেন। বলতে গেলে স্যারই মনে হয় ওই সময়টা আমাদের থেকে বেশি পড়াশোনা করেছিলেন। স্যার প্রত্যেকটা টপিক অনেক সুন্দর করে আমাদের জন্য প্রস্তুত করতেন। আর এদিকে আমি আর রাজিবও তুমুল পড়াশোনা করতে থাকি। এরকম একজন আদর্শ শিক্ষক থাকলে বিবেকবান ছেলেরা পড়াশোনা না করে পারে!

করোনা মহামারীর কারণে এভাবেই বহুদিন ভর্তি পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা করলাম। স্যারের ফোনে অনলাইনে ২/১টা পরীক্ষা দিলে দেখলাম যে, অনেক বাঘা বাঘা ছাত্র আমার ও রাজিবের পিছনে। তখন স্যার বলতেন, "এভাবে পড়লে তোমাদের ঢাবিতেই হবে ইনশাআল্লাহ।"

তারপর দেখতে দেখতে ভর্তি পরীক্ষা চলে আসলো; রাজিব বিইউপি-তে প্রথম পরীক্ষা দিলেও ঢাবিতেই আমি আমি প্রথম পরীক্ষা দিলাম। এমসিকিউ খারাপ হওয়ায় আমি পরীক্ষার হলেই হাল ছেড়ে দিই এবং রিটেন লিখতে গিয়ে কাঁদতে থাকি। তারপর বাইরে এসে শুনি সবারই এমসিকিউ খারাপ হয়েছে। স্যার বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি বের হয়েই স্যারকে দেখে কান্নাজুড়ে দিই এবং সব খুলে বলি। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য ভালো লাগে, কেননা রাজিব বেশ ভালো পরীক্ষা দিয়েছে। সেদিন স্যার আমাকে খুব করে বুঝালেন যে, আরও অনেক বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় আছে; তুমি সেগুলোতে ভালো করবা ইনশাআল্লাহ। এভাবে এক এক করে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ হয়ে যায়। প্রথমেই আমি ও রাজিব রাবিতে চান্স পেলাম। এলাকায় হৈ হৈ রৈ রৈ উঠে গেল। তিনি এতোদিন সত্যিই ২ জনকেই তার সন্তানের স্নেহে আগলে রেখেছেন। তাইতো দুই সন্তানের সাফল্যে তিনি আনন্দে আত্মহারা। আমার আব্বাকে বললেন, "সাইফুর তোকে বলেছিলাম না, শামীম ভালো করবে!"

কিন্তু এই আনন্দ আর বেশি দিন রইলনা! রাবির রেজাল্টের এক সপ্তাহ পরে স্যারের হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে গেল। এলাকার সক্রেটিস, হাজারও জনের প্রিয় ব্যক্তিত্ব, আমার প্রিয় শিক্ষক মফিদুল স্যার আর রইলেন না। আমাদের সংকীর্ণ জ্ঞানকে পূর্ণতাদানের মানুষটিকে আমরা হারিয়ে ফেললাম। তারপর আমি আর রাজিব লাইব্রেরিতে বসলে কান্না ছাড়া কখনো বই পড়তে পারিনি।

ধীরে ধীরে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজাল্ট হতে থাকে। রাজিবের ঢাবিতেও চান্স হয়, আমি ওয়েটিংয়ে থাকি। বাকিগুলোতে আমাদের দুইজনেরই চান্স হয়। কিন্তু আমাদের জীবনে আর আনন্দ আসেনা; সব আনন্দ সক্রেটিস মশাই নিয়ে চলে গেছেন। হয়তো আনন্দ নামের ডোপামিনটা তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হেমলক পান করেছে!

স্নাতক পর্যায় : দ্বিতীয় স্থান

আমার দেখা সেরা শিক্ষক

রাফায়েতুল আহম্মেদ

নাট্যকলা বিভাগ শহীদ হবিবুর রহমান হল

সূচনা : শিক্ষকতা কেবলমাত্র জ্ঞান বিতরণের মাধ্যম নয়, বরং শিক্ষার্থীদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়ার একটি পবিত্র দায়িত্ব। শিক্ষকরা সমাজের ভিত্তি তৈরি করে, কারণ তারা আগামী প্রজন্মকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলেন। একজন দক্ষ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা দিয়ে জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করেন। একজন আদর্শ শিক্ষক তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের সাফল্যের পথে নিয়ে যান। আমার জীবনেও এমন একজন সেরা শিক্ষক ছিলেন।

আমার দেখা সেরা শিক্ষক

আমার দেখা সেরা শিক্ষক, পরাগ হাসান, ছিলেন এমন এক মহান শিক্ষক, যার অনুপ্রেরণা ও দিকনির্দেশনা আমার জীবনের প্রতিটি স্তরে আলোকবর্তিকা হয়ে আছে। আমি যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছিলাম, তখন তাঁর স্নেহ এবং শিক্ষাদানের উপায় আমাকে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করেছিল। তাঁর প্রতিটি ক্লাস ছিল যেন এক নতুন জগতের দ্বার উন্মোচন। বইয়ের পাতার বাইরেও তিনি আমাদের শেখাতেন জীবনের অর্থ, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য, এবং মানবিকতার পরম স্নেহ।

শিক্ষার প্রতি গভীর ভালোবাসা

পরাগ স্যার ছিলেন শিক্ষার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। তাঁর চোখে শিক্ষার মানে ছিল না শুধু পরীক্ষার ফলাফল, বরং শিক্ষার্থীর মনের গভীরে জ্ঞানের আলো প্রোথিত করা। তিনি আমাদের শেখাতেন যে, শিক্ষা কোনোদিনই শেষ হয় না। প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত নতুন কিছু শেখার সুযোগ এনে দেয়। তাঁর ক্লাসে আমরা শুধু পাঠ্য বইয়ের জ্ঞান নিয়েই বদ্ধ থাকতাম না; তিনি আমাদের জীবনমুখী শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, 'শিক্ষা হলো সে আলো, যা কখনো নিভে যায়না। এটি তোমার চিন্তাধারাকে প্রসারিত করে, তোমার মনকে খোলা আকাশের মতো উদার করে তোলে।'

তাঁর ক্লাসে কখনো আমরা ক্লান্ত হতাম না। তাঁর শেখানোর ধরন ছিল এতটাই প্রাঞ্জল এবং আকর্ষণীয় যে, আমরা সবাই তাঁর কথায় মগ্ন থাকতাম। জটিলতম বিষয়গুলোও তিনি এমনভাবে বোঝাতেন যে, তা সহজেই আমাদের বোধগম্য হতো। প্রতিটি পাঠ্যাংশকে তিনি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দিতেন, যাতে আমরা বইয়ের বাইরে বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক বুঝতে পারি।

শৃঙ্খলার প্রতি তাঁর অগাধ আস্থা

শৃঙ্খলা পরাগ স্যারের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। তিনি সবসময় আমাদের শেখাতেন যে, জীবনে শৃঙ্খলা ছাড়া কোনো বড় অর্জন সম্ভব নয়। তিনি বলতেন, 'শৃঙ্খলা ইহলো তোমার জীবনের মূলভিত্তি। তুমি যত বড় স্বপ্নই দেখোনা কেন, শৃঙ্খলার সঙ্গে যদি পথ চলতে না পারো, তাহলে সেই স্বপ্ন কখনোই বাস্তবে রূপ নেবে না।'

ক্লাসের ভেতরে এবং বাইরে, তিনি সময়ের গুরুত্ব এবং প্রতিদিনের পরিকল্পনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। প্রতিদিন সকালে আমরা তাঁর কাছ থেকে শিখতাম কিভাবে একটি দিনকে সুন্দরভাবে পরিকল্পনা করে শুরু করতে হয়। সময়ের সঠিক ব্যবহার কিভাবে জীবনে সফলতার চাবিকাঠি হতে পারে, সেটি তিনি আমাদের মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, 'জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান, তুমি যদি সময়কে সম্মান করতে পারো, তাহলে সময়ও তোমাকে সফলতার পথে নিয়ে যাবে।'

শিক্ষার্থীদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা

পরাগ স্যারের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল তাঁর শিক্ষার্থীদের প্রতি অসীম ভালোবাসা এবং যত্নশীলতা। তিনি শুধু আমাদের শিক্ষকের ভূমিকায় থাকতেন না, বরং আমাদের জীবনের এক বিশেষ অভিভাবক হিসেবে সবসময় পাশে থাকতেন। কোনো শিক্ষার্থী যদি পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ত, স্যার কখনো তাঁকে বকাঝকা করতেন না, বরং ধৈর্যের সঙ্গে বারবার বোঝাতেন। তাঁর এই নিরলস পরিশ্রম এবং স্নেহময়তা আমাদের ভেতরে এক ধরনের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছিল। তিনি সবসময় আমাদের বলতেন, 'ভুল করতে ভয় পেওনা, কারণ প্রতিটি ভুলই তোমাকে নতুন কিছু শেখায়।'

তাঁর এই মনোভাব আমাদের মধ্যে সাহস জাগাতো এবং আমাদের মাঝে নতুন আশার সঞ্চার করতো। তিনি সবসময় বলতেন, 'তোমার প্রতিটি সাফল্যের পেছনে লুকিয়ে থাকে তোমার ব্যর্থতা। সুতরাং, ব্যর্থতায় ভেঙে না পড়ে আবার উঠে দাঁড়াও, কারণ সফলতা তোমার অপেক্ষায় রয়েছে।' এই কথাগুলো আজও আমার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আমাকে সাহস জোগায়।

শিক্ষার বাইরে মূল্যবোধের শিক্ষা

শুধু পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানই নয়, পরাগ স্যার আমাদের শেখাতেন জীবনের মূলমন্ত্র নৈতিকতা, সততা, এবং মানবিকতা। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা শুধু মস্তিষ্কে গেঁথে রাখার বিষয় নয়, বরং মন ও আত্মাকে আলোকিত করার এক মহাসাধনা। তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন, একজন প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি সেই, যে তার জ্ঞানকে শুধু নিজের স্বার্থে নয়, বরং সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করে। তিনি বলতেন, 'তোমার জ্ঞান যদি মানুষের কল্যাণে না আসে, তাহলে সেই জ্ঞান সম্পূর্ণ নয়।'

তাঁর শেখানো মূল্যবোধ আমাদের চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। স্যার সবসময় আমাদের বলতেন, 'মানুষের প্রতি ভালোবাসা আর সম্মান ছাড়া শিক্ষার কোনো মানে হয় না।' আমরা তাঁর কাছ থেকে শিখেছি কিভাবে একে অপরকে সম্মান করতে হয়, কিভাবে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা একে অপরের পাশে দাঁড়াতে পারি।

আধুনিকতা ও প্রযুক্তির প্রতি তাঁর দৃষ্টি

যদিও স্যারের সময় প্রযুক্তির এতটা প্রসার ঘটেনি, তবুও তিনি সবসময় আধুনিক চিন্তাভাবনার প্রতি জোর দিতেন। তিনি বলতেন, 'প্রযুক্তি হলো একটি যন্ত্র, যা তোমার চিন্তাশক্তিকে আরও প্রসারিত করতে পারে, যদি তুমি একে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারো।' তিনি আমাদের শেখাতেন, কিভাবে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে আমাদের শিক্ষার গতিকে আরও গতিশীল করা যায়।

তিনি বিশ্বাস করতেন, 'যুগ বদলায়, সময় বদলায়, কিন্তু তোমার শেখার ইচ্ছা যদি দৃঢ় থাকে, তাহলে তোমার জন্য কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।' এই কথাগুলো আমাদের ভেতরে অদম্য আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল। তিনি আমাদের অনুপ্রাণিত করতেন নতুন কিছু শিখতে, নতুন কিছু জানতে। তাঁর শেখানো এই দৃষ্টিভঙ্গি আজও আমাকে প্রতিনিয়ত নতুন কিছু শেখার জন্য উদ্দীপ্ত করে।

শিক্ষার আনন্দ ও সৃজনশীলতার বিকাশ

পরাগ স্যার সবসময় শিক্ষাকে আনন্দময় করতে চাইতেন। তিনি বলতেন, 'শিক্ষা যদি আনন্দদায়ক না হয়, তবে সেই শিক্ষা পূর্ণতা পায়না।' তাঁর ক্লাসে আমরা কখনো শুধুবই মুখস্থ করতাম না; তিনি আমাদের বিভিন্ন গল্প, চিত্র, এবং উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়গুলো বোঝাতেন। তিনিবলতেন, 'তোমার সৃজনশীলতা হলো তোমার মনের দরজা, যা তোমাকে নতুন চিন্তার জগতে নিয়ে যায়।' তাঁর কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা সবসময় নতুন কিছু করার চেষ্টা করতাম।

আজও অনুপ্রেরণা হয়ে আছেন

আজও, এতদিন পর, পরাগ স্যারের প্রতিটি কথা আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে অনুপ্রেরণা হয়ে আছে। তাঁর শেখানো নৈতিকতা, মূল্যবোধ, এবং শৃঙ্খলার পাঠ আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজ করছে। তাঁর সেই স্নেহময় মুখ, মধুর ভাষা, এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ আমার মনের গভীরে গেঁথে রয়েছে।

পরাগ স্যার শুধু আমার দেখা সেরা শিক্ষকই নন, তিনি আমার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ পথপ্রদর্শক। তাঁর শিক্ষার আলো আজও আমার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আলোকবর্তিকা হয়ে আছে। একজন প্রকৃত শিক্ষক সেই, যিনি শুধু বইয়ের জ্ঞান দেন না, বরং শিক্ষার্থীর জীবনের প্রতিটি বাঁকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেন। পরাগ স্যার সেই শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম, যাঁর প্রতি আমার হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা রয়েছে।

উপসংহার

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্য পেতে একজন আদর্শ শিক্ষকের প্রভাব অপরিসীম। পরাগ স্যার সেই আদর্শ শিক্ষক, যিনি আমার জীবনের প্রতিটি স্তরে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে আমাকে গড়ে তুলেছেন। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা চিরকালীন। তাঁর শিক্ষার আলো আমার জীবনে চিরকাল জ্বলে থাকবে, এবং আমি সবসময় তাঁর শেখানো পথে চলার চেষ্টা করব।